International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-II, September 2019, Page No. 36-41
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i2.2019.36-41

সেলিনা হোসেনের *সোনালি ডুমুর* : পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুর অভিশপ্ত জীবনালেখ্য

মেহেবুব আলম
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

If we find the partition from a geographer point of view, then it can be seen, it is essentially a division of Bengal and Punjab in Indian context. It more deeply is to say, the division two major powerful territory is simply based on religion. Actually the British government had spread the bait of sectarianism among us, don't think about its far-reaching impact in the future, we accept it without consideration. As a result evil of sectarianism till now.

Selina Hossain is one of the most famous writer in Bangladesh today. Already she has become world-class beyond the boundaries of the country. However she is widely known as a novelist. In her novels political history, nation, peoples and society gained more importance. How was the situation of minority Hindus in East Bengal after partition, in this context she wrote her 'Sonali Dumur' novel.

In the novel Animesh's family had to change their residence not once but three times. In their own country they had become refugee. The rioters killed all the members of many families Like Madhurilata and Nripen's families. Many women were forcefully kidnapped. Many Hindus were forcefully converted Muslim. And all this happened in the direct support of the Pakistan government. Again Pakistan government captured the property belong to the minority by requisition and marking them as enemy property. At the one side, the mentally and physically torture of Muslims on the Hindus, on the other hand, in the wake of the government's suppression policy. All these real images are carefully sketched by Selina Hossain in this novel.

আমরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে নেব, সেলিনা হোসেন আজ ওপার বাংলা তথা বাংলাদেশের একজন অন্যতম প্রধান লেখক। তিনি জন্মেছিলেন ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন, রাজশাহীতে। তিনি নিজ গুণেই কেবল বাংলাদেশের নয়, বাংলা ভাষারও আজ একজন বরেণ্য লেখক। ইতিমধ্যেই তিনি দেশের গণ্ডি অতিক্রম করে হয়ে উঠেছেন বিশ্বময়। তবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটে কথা-সাহিত্যিক হিসেবেই। দেশ, দেশের মানুষ, সময় ও সমাজ একই সাথে তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়েছে। তাঁর উপন্যাসে রাজনৈতিক সময় বা রাজনৈতিক আন্দোলন অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করেছে। সেলিনা হোসেন বরাবরই তাঁর উপন্যাসে সমকালের সমস্ত রকম সমস্যাকে স্থান দিয়েছেন। যত জটিল সমস্যাই হোকনা কেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে থাকেননি। তাই তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে কখনও দেশভাগ, কখনও ভাষা আন্দোলন, আবার কখনোবা মুক্তিযুদ্ধের মতো জ্বলন্ত সমস্যা। দেশভাগের পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরিস্থিতি কেমন ছিল, সেই প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন তাঁর *সোনালি ডুমুর* উপন্যাসটি। আমরা এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করব, স্বাধীনতা লাভ এবং দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলমানের অত্যাচার এবং মুসলমান সরকারের দমন নীতির জাতাকলে পড়ে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জীবন কীভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটির প্রথম আনন্দ সংস্করণ ডিসেম্বর ২০১২। উপন্যাসের পটভূমি পূর্ব পাকিস্তান। ততদিনে পাকিস্তান একটি ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে বাঙালির এই নতুন পরিচয় তাদের জীবনে কাল হয়ে

দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের আখ্যান শুরু হয় এক সর্বহারা উদ্বাস্তু পরিবারের পথ চলার মধ্য দিয়ে। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হবার কারণে তারা তাদের ঘরবাড়ি বিক্রি করে চলে এসেছে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু বড় ভাইয়ের ছেলে প্রফুল্ল তাদের তাড়িয়ে দিলে তারা আবার নিজের দেশেই ফিরে আসে। শুধু কি দেশ ত্যাগ করলেই উদ্বাস্তু হয়? কিন্তু অনিমেষদের দেখলে বোঝা যায় সংখ্যালঘুরা নিজ দেশেও উদ্বাস্তু, নিজ দেশেও তারা মূল্যহীন। ভারত থেকে ফিরে আসার কারণে অনিমেষরা নিজ গ্রামেই বাস করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মুসলিম লিগের পাণ্ডা ওয়াহেদ মিয়া জানে মেরে ফেলার হুমকি দিলে, তাদের সে গ্রামের মায়াও ত্যাগ করতে হয়। তিলতিল করে পুনরায় এই পরিবারটি নতুন জীবন শুরু করে চাঁদপুরে এসে। সেখানে কিছু কাল থিতু হলেও উপন্যাসের সমাপ্তিতে অনিমেষদের সে বাড়িও পরিত্যাগ করতে হয়েছে। এই পরিবার থেকে রিকুইজিশন করে পাকিস্তান সরকার তাদের বাড়ি কেড়ে নিয়েছে। ফলে গোটা উপন্যাস জুড়ে নায়ক অনিমেষ ও তার পরিবার যাযাবরের মতো জীবন যাপন করেছে।

তবে এই পরিবারটি চাঁদপুরে এসে যেন পুনরায় বাঁচার অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। এ গ্রামে এসেই অনিমেষ ও তার দুই বোন শীলা ও দোলা স্কুলে ভর্তি হয়েছে। এখানেই অনিমেষের নতুন বন্ধু হয়েছে আশরাফ, মোস্তফা ও মেঘনা নদী। সন্তানদের এক নতুন জগৎ গড়ে উঠছে দেখে পরিবারের সকলে খুশি। এগ্রামে এসেই তাদের ছন্নছাড়া জীবন যেন পেয়েছে এক নতুন গতি।

দুই

সমাজ সচেতন লেখক সেলিনা হোসেন তাঁর গোটা উপন্যাস জুড়ে শুধুই নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরেননি। তাঁর উপন্যাসে উঠে এসেছে পূর্ববঙ্গের মানুষের ইতিবাচক দিকগুলিও। সেকারণেই নানান ইতিবাচক ও নেতিবাচক চরিত্রেরা তাঁর উপন্যাসে ভিড় করেছে। যদি আমরা উপন্যাসের বিশেষ চরিত্র গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করি, তাহলে যেসব নেতিবাচক চরিত্রগুলি আমরা পাবো সেগুলি হল- মুসলিম লিগের পাণ্ডা ওয়াহেদ মিয়া, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, আইয়ুব খান, মোনায়েম খান প্রমুখ। আর অন্যদিকে ইতিবাচক চরিত্র গুলি হল- অনিমেষ, মাধুরীলতা, ভূদেব দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যনারায়ণজি, আবদুল মালেক, ডাক্তার মন্মথনাথ নন্দী প্রভৃতি। এই সমস্ত চরিত্রগুলি উপন্যাসের মূল কাহিনিকে ক্রমশ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

দশ বছর বয়সি অনিমেষের কাছে হিন্দু-মুসলমান কোনও ভেদ নেই। এ বয়সেই সে বন্ধুত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছে। এ প্রসঙ্গে আশরাফ ও মোস্তফাকে সে জানায়, ধর্ম দিয়ে বন্ধুত্ব হয়না। বন্ধুত্বে থাকে মনের টান। অনিমেষের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে গ্রামে মেয়েদের স্কুল তৈরির জন্য, ধনী হিন্দুদের ফেলে যাওয়া জায়গার বদলে কালী মন্দিরের ফাঁকা জমি দখল করার উদ্দেশ্যে স্কুলের সমস্ত ছাত্ররা গেলেও কিন্তু অনিমেষ যায়নি। বরং হেড স্যারের এমন কাজকে সে কোনও মতে সমর্থন করেনি। এই প্রধান শিক্ষকই আবার গ্রামের আঁকাবাঁকা রাস্তা সোজা করার জন্য ভূদেব দত্তের বাগান বাড়ি জোর করে দখন করেন। তথাপি এই চরিত্রটিকে আমাদের নেতিবাচক চরিত্র হিসেবে গণ্য করতে দ্বিধা হয়। কেননা, তিনিই আবার অঘোর স্যারের চার মেয়ে এবং সীতাং মাস্টারের দুই মেয়ের বিয়ের খরচের সমস্ত দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। তবে গান্ধি আদর্শে বিশ্বাসী সত্যনারায়ণের সাথে প্রধান শিক্ষকের তুলনা প্রসঙ্গে অনিমেষ বলেছে-

দু'জনের কাজ মানুষের জন্য হলেও বেশ বড় ধরণের পার্থক্য আছে। একটি কাজে যুক্ত আছে মানুষের বিনয় ও নম্রতা। অন্য কাজে যুক্ত আছে ক্ষমতা ও দম্ভ। লক্ষ্য এক হলেও পথ ভিন্ন।[১]

এই প্রসঙ্গে সত্যনারায়ণের কথা না বললেই নয়। তবে তাঁর কথা বলার পূর্বে আর একটি বিষয় আমাদের জানা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। যিনি মহারাজ নামে পরিচিত। তাঁর অনুকরণে এই উপন্যাসে সত্যনারায়ণজি নামক চরিত্রটি লেখক এঁকেছেন। এই ত্রৈলোক্যনাথ স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ত্রিশ বছর বৃটিশ কারাগারে বন্দি ছিলেন। যে নির্যাতন ও অত্যাচার তিনি ভোগ করেছেন বৃটিশ শাসনে, দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গেও তাঁকে সেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। দেশভাগের পরেও তিনি দেশের মানুষের জন্য কিছু করার উদ্দেশ্যেই এদেশ ছেড়ে কখনই যাননি। কিন্তু ১৯৬৫-সালে তাঁকেও জেলে পাঠানো হয়েছিল অন্যান্য হিন্দু নেতাদের সাথে। এই প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভের সাথেই জানান-

...এই দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন, যাঁহাদের নির্যাতন ভোগের ফলে আসিয়াছে দেশের স্বাধীনতা, আমি তাহাঁদের একজন। আমি দেশের স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গত ১৮ বৎসর যাবৎ গঠনমূলক কাজই

করিয়া আসিয়াছি। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু করি নাই। আর আমার দেশসেবার পুরস্কার স্বরূপ আমার স্থান হইয়াছে জেল।[২]

যেহেতু লেখক ত্রৈলোক্যনাথের আদলে সত্যনারায়ণজি নামক চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন, তাই ত্রৈলোক্যনাথের চারিত্রিক গুণাবলী সত্যনারায়ণের মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। এই সত্যনারায়ণজি গান্ধিজির ডাকে সারা দিয়ে নোয়াখালিতে এসেছিলেন। তবে সেখান থেকে তিনি আর কখনই ফিরে যাননি। গরিব মানুষের সেবা করবেন জন্যই তিনি এখানে থেকে যান। অনিমেষের বোন শীলার সাথে বিবাহ স্থির হয় নৃপেন কণ্ডুর। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নৃপেনের বাবা, মা ও বড় দুই ভাই নিহত হলে, গান্ধিজি তাকে সত্যনারায়ণের হাতে অর্পণ করেন। সেই থেকে সত্যনারায়ণই নৃপেনের অভিভাবক। তিনি সর্বদা অন্ধকার দূর করতে চান। তাই তিনি অন্ধকার পথে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখেন, যাতে মানুষ আলো দেখে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এমনকি তিনি এও জানিয়েছেন, মৃত্যুর পর তাঁর দেহের সৎকার না করে যেন বাড়ির এক কোনায় মাটি দেওয়া হয়। আর যদি তাঁর কোনও সঞ্চয় থাকে, তাহলে তা তিনি মৃত্যুর পূর্বেই জনহিতকর কাজের জন্য উইল করে যাবেন। মৃতদেহের কেন সৎকার করা হবেনা, অনিমেষের এমন প্রশ্নে তিনি জানান-

দেখছ না, আমি কত লম্বা মানুষ। আমাকে পোড়াতে অনেক কাঠ-ঘি খরচ হবে সেজন্য সৎকার চাই না। তা ছাড়া আমাকে লম্বা করে মাটি দেওয়া হলেও অনেকখানি জায়গা নষ্ট হবে, সেজন্য ঠিক করেছি সবাইকে বলে যাব যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন হাঁটু দু'টো মুড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর আমাকে সোজা করে বসিয়ে মাটি দিলে বেশি মাটি খরচ হবে না।[৩]

কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাঁকে দুমাস জেলে আটকে রাখে। তথাপি তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, জেল-জুলুম সহ্য করে হলেও এদেশেই থাকবেন। মানুষের সেবা করবেন। গান্ধিজির অহিংস বাণী প্রচার করবেন।

তিন

সাহিত্য ও ইতিহাস একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যখন বাস্তবিক কোনও ঘটনা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হয়, সে সাহিত্য পাঠের পূর্বে বাস্তব সত্য সম্পর্কে আমাদের এক স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। নয়তো বাস্তব সত্য সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত বা বিপরীত ধারণা জন্মাতে পারে।

কথায় আছে মুসলমান মাত্রই মুসলমানের ভাই। তাই কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হলে, তার প্রভাব এসে পড়ে সুদূর পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতেও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ খুঁজতে গিয়ে লেখক চারটি কারণের কথা আমাদের জানিয়েছেন, প্রথমত- ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয়ত- কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের রাজনৈতিক স্বার্থ, তৃতীয়ত- ক্ষমতার ক্ষোভ, চতুর্থত- পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস।

আমরা জানি পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় কোনও কোনও পরিবারের সকল সদস্যকেই হত্য করা হয়েছে। নোয়াখালির এই ভয়ঙ্কর দাঙ্গা স্বয়ং গান্ধিজিকেও নোয়াখালিতে ছুটে আসতে বাধ্য করেছিল। তাঁর ভাষায়-

It is the cry of outraged womanhood that has promptly called me to Noakhali.[৪]

গান্ধিজি সেদিন নোয়াখালিতে এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন, প্রার্থনাসভা করেছিলেন, অসংখ্য মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন, অহিংস বাণী প্রচার করেছিলেন আর শান্তির পক্ষে কাজ করেছিলেন।

নোয়াখালির দাঙ্গার ছবি এ উন্যাসেও ফুটে উঠেছে বার বার। দাঙ্গার ভয়াবহতাকে লেখক কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসের স্কুলশিক্ষক ভূদেব দত্তের নাতনি মাধুরীলতা। দাঙ্গার এক তিক্ত স্মৃতি তার মনে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে। কেননা আমরা উপন্যাসে লক্ষ্য করেছি, নোয়াখালির দাঙ্গার সময় দেড়দিন পর রক্তের মধ্যে তাকে কুড়িয়ে পাওয়া যায় জ্ঞানহারা অবস্থায়। দাঙ্গা তার বাবা-মা সহ একই পরিবারের মোট এগারোজন সদস্যকে গিয়ে খেয়েছে। তাকে উদ্ধার করেছিল তারই প্রতিবেশী সতীশমজুমদারের স্ত্রী। মাধুরীলতার পরিবার মুসলমান হতে চায়নি জন্য এই নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়েছে মুসলমান দাঙ্গাবাজরা। সতীশ মজুমদার ও তার স্ত্রীর সামনে তাদের সন্তানের গলায় ছোরা ধরে এই দাঙ্গাবাজরা। ফলে তাদের দুজনকেই কলেমা (লাইলাহা ইল্লালাহু) পড়িয়ে, গোমাংস খাইয়ে মুসলমান বানিয়ে তবেই ছেড়েছে। সতীশ মজুমদারের ভাষায়-

ছেলেমেয়েগুলো চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলে ওদের গলার কাছে ছোরা ধরে দাঙ্গাবাজরা। আমি ওদের পা জড়িয়ে ধরে বলি, আমাদের মুসলমান করেন। বেলাও কাঁদতে কাঁদতে একই কথা বলে। তখনও একজন বলে, তোরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কলেমা বল। লাইল্লাহা ইল্লালাহু-। আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পড়ি।[৫]

সতীশ মজুমদারের মুখ থেকে বর্ণিত নোয়াখালির দাঙ্গার এই চিত্র থেকে আমরা অনুভব করতে পারি, দাঙ্গাবাজ মুসলিমরা পূর্ববঙ্গে সেদিন কত ভয়ংকর বারাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সতীশদের কাজিরখিল গ্রামই শুধু নয়, চণ্ডীপুর, মাছিমপুর, নন্দনপুর, সোনাপুর ইত্যদি সমস্ত গ্রামেরই একই অবস্থা। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে, সতীশ পুনরায় নিজ ধর্ম পালন করেছে। সতীশের মতো অনেকেই পুনরায় তাদের বেঁচে থাকার ইচ্ছা শক্তি ফিরে পেয়েছে, একমাত্র গান্ধিজিকে কাছে পেয়েই। সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে গান্ধিজিই ছিল তাদের একমাত্র আশার আলো। গান্ধিজি তাদের আবার রামনাম কীর্তন করতে বলেন। তিনি আশ্বাস দেন, তাদের জাত-ধর্ম এখনও নষ্ট হয়নি।

নোয়াখালির দাঙ্গার সবচেয়ে বীভৎস দিক ছিল নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার। দাঙ্গাবাজরা কখনও মেয়েদের জোর করে তুলে নিয়ে গেছে, বলপূর্বক বিয়ে করেছে, আবার কখনোবা ধর্ষন করেছে। পাশবিক অত্যাচার থেকে সেদিন বাদ যায়নি বাড়ির বৃদ্ধারাও। তাই দাঙ্গার পরে গান্ধিজি তাঁর কর্মীদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেক আশ্রম খুলেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল- গ্রামের অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও ধর্ষিত নারীরা এখানে মানসিক ও শারীরিক শান্তি পাবে, সেবা-সুশ্রুষা পাবে, চিন্তা মুক্ত ভাবে জীবন কাটাবে, চরকায় সুতো কাটবে, নিজের সমস্ত অবষাদ দূর করে নিজেকে পুনরায় আগের মতোই সতেজ করে তুলবে। এই উপন্যাসে কুমিল্লা শহরে এমন এক আশ্রম আছে, যার নাম কস্তুরবা গান্ধী ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। সেখানকার কন্যা শিক্ষালয়ে অনিমেষের রুমমেট সুহাসের তিন দিদি প্রতিমা, প্রমীলা ও প্রভাবতীকে রাখা হয়। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তাদের বাবাকে দাঙ্গাকারীরা তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে মাটিতে পুতে দিয়েছিল, সুহাসের তিন দিদিকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করেছিল এবং তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

চার

দাঙ্গা শব্দটি শোনামাত্রই আমরা শিউরে উঠি। এ উপন্যাসের প্রায় বেশিরভাগ হিন্দু পরিবারগুলিই এই দাঙ্গার ভয়ঙ্কর রূপটি স্বচক্ষে দেখেছে। তবে লেখক শুধু দাঙ্গার মধ্যে দিয়েই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটাননি। দেখিয়েছেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি ঘটনাও। কয়েকটি বিশেষ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক এই সম্প্রীতির ছবিটি তুলে ধরেছেন। এমন একজন চরিত্র হলেন ধীরেন্দ্রনাথ। তিনি অনিমেষ ও তার বন্ধু সুহাসকে জানান, ইংরেজরা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ বপন করেছে, আমাদের উচিত তা উপড়ে ফেলে উভয় সম্প্রদায় আবার পূর্বের মতো মিলেমিশে পাশাপাশি সহবস্থান করা। তিনি আরও জানান, দাঙ্গা মূলত কিছু সংখ্যক মানুষ তাদের উস্কে দেওয়া কথা ও লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের দ্বারা ঘটিয়ে থাকে। তাই আমাদের উচিত, আমাদের মাঝে যে ভুল বোঝাবুঝি আছে সেটা দূর করা। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান-

উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা হয়। অথচ দুই কমিউনিটি তো খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইরিশ ও ইতালিয়ান ক্যাথলিক বাস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও ধর্মীয় দাঙ্গা হয় না।[৬]

তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এ দেশ ছেড়ে কখনই ভারতে যাবেন না। বরং তিনি এখানে থেকেই সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করবেন। তাতে তিনি সফল হবেন কিনা তা না ভেবে, শুধু তাঁর কর্ম করে যেতে চান।

সম্প্রীতির চরম নিদর্শন আমরা লক্ষ্য করি অনিমেষ ও তার ঢাকা শহরের মুসলিম বন্ধু আবদুল মালেকের বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে। ভারতের মুর্শিদাবাদ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে আবদুল মালেক ও তার পরিবার। তাই হয়তো দুই উদ্বাস্তু বন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক এত গভীর। অনিমেষের এই রিকশাচালক বন্ধুর অভাবের দিনে অনিমেষ তাদের চাল-ডাল-আলু কিনে দিয়েছে। এবং তাদের সাথে ভাত খাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। হিন্দুরা তো মুসলমানের বাড়িতে খায়না- এমন প্রশ্নে অনিমেষ জানিয়েছে-

রিকশাদাদা আমি শুধু হিন্দু না। মানুষও।[৭]

পাঁচ

উপন্যাসের একটি স্থানে লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ টেনেছেন। উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন পাকিস্তান সরকার ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ করেছেন। নিষিদ্ধ হয় রেডিওতে রবীন্দ্র সংগীতের সম্প্রচার। আর নিষিদ্ধ হয় ১৯৬১-সালের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন। এ প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ওপর সরকারের অনৈতিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য ফ্ল্যাশব্যাকে পিছিয়ে যাব। ইতিহাসের বুক চিঁড়ে দেখার চেষ্টা করব প্রকৃত সত্যকে। যে সত্যের সাথে এই উপন্যাসের এক নীবিড়তম যোগাযোগ রয়েছে।

পাকিস্তানের সেনাপতি আইয়ুব খান সরকারে পরিণত হবার পর রাজনীতিতে নামলে, সে রাজনীতি ছিল একান্ত ভাবেই হিন্দু বিরোধিতার রাজনীতি, কাল্পনিক ভারতীয় আগ্রাসনবাদ প্রতিহত করার রাজনীতি, ইসলামকে রক্ষা করার নামে জনগণের মৌল অধিকার হরণের রাজনীতি।

একজন আদর্শ নেতা সর্বদা সকলকে সাথে নিয়েই পথ চলেন। সর্ব ধর্মের মানুষই তাঁর কাছে সমান মর্যাদা পায়। তাঁর কাছে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকেনা, থাকেনা কোনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবও। এমন একজন আদর্শ নেতা হিসেবে আমরা চৈতন্য দেবের নাম নিতে পারি। যিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের সাথে মিশে গিয়ে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন।

একদা জার্মানিতে হিটলার খৃষ্ট ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ইহুদীদের বিতারণের নামে যে অত্যাচার চালিয়েছিল, গোটা বিশ্ব ও বিশ্ব ইতিহাস তার সাক্ষি রয়েছে। এদিক থেকে দেখলে হিটলার ও আইয়ুব খানকে পৃথক করে দেখার প্রয়োজন হয়না। এক্ষেত্রে উভয়ই যেন একই পথের পথিক। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি একজন মধ্যযুগের ধর্মান্ধ শাসকের সাথে তুলনীয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু হবার কারণে নিষিদ্ধ হলেন। কিন্তু আইয়ুব খান হয়তো জানতেন না, সাহিত্য কখনই ধর্ম-দেশ-কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। সাহিত্যের আবেদন মূলত মানব হৃদয়ে। আর মানব হৃদয় কখনই শাসকের চোখ রাঙানিকে প্রশ্রয় দেয়না। শিল্পির যেমন স্বাধীনতা আছে, তেমন স্বাধীনতা আছে পাঠকেরও। কিন্তু একদা পাকিস্তানের সরকার পাঠকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। অর্থাৎ ১৯৬১-সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন প্রবলভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকার তৎপর হয়ে ওঠে। আইয়ুব খানের হয়তো জানা ছিল না, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাঙালির পরিচয় ভারতীয় কিংবা পাকিস্তানি নামে হলেও রবীন্দ্রনাথকে অন্তত বাঙালিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না।

রবীন্দ্রনাথ সর্ব ধর্মের উর্ধ্বে। তাঁকে জাত-পাতের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায়না। ফলে ইসলাম ধর্মের রাষ্ট্রেই রবীন্দ্রনাথ নিষিদ্ধ হবার কারণে, মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই সর্বপ্রথম সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নামলেন। শেখ মুজিবুর রহমান রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন-

আমরা এই ব্যবস্থা মানি না--আমরা রবীন্দ্রনাথের বই পড়িবই, আমরা রবীন্দ্রসংগীত গাহিবই এবং রবীন্দ্রসংগীত এই দেশে গীত হইবেই।[৮]

শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতিবাদে পাকিস্তান সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্র সংগীত পুনরায় সম্প্রচারিত হতে থাকে। এই বাস্তবতার সাথে মিল রেখেই লেখক তাঁর উপন্যাসের কাহিনিক্রম সাজিয়ে তুলেছেন। ডাক্তার নন্দীর বাড়িতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে চলতে থাকে রবীন্দ্র নৃত্য ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের রিহার্সাল। ধুমধাম করে পালিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। রবীন্দ্রনাথকে কখনই বাংলা সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছেদ করা যায়না। তাঁকে বিচ্ছেদ করার ক্ষমতাও জাতীয়তাবাদী শক্তির নেই। রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষীদের নাড়ির এক গভীর বন্ধন রয়েছে। কোনও সরকারি আইন দিয়ে সে বন্ধন ছিন্ন করা যাবে না। তাই উপন্যাসের এক চরিত্র কামাল লোহানী বলেছেন-

রবীন্দ্রনাথকে এই দেশে নিষিদ্ধ করবে এমন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের জন্ম হয়নি।[৯]

ছয়

উপন্যাসে যখন সমস্ত কিছুই ঠিকঠাক ছিল, ঠিক তখনই ঘটে এক অঘটন। মোনায়েম খান (পাকিস্তান সরকার)-র মদতে ১৯৬৪-সালে ঢাকায় তুমুল দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। সরকার একদিকে হিন্দুদের ওপর রিকুইজিশন করে এবং অন্যদিকে দাঙ্গাবাজদের দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভাবে দাঙ্গা ঘটিয়ে হিন্দুদের বাস্তুছাড়া করে। উদ্দেশ্য একটাই, পাকিস্তানকে হিন্দু মুক্ত

দেশ গড়ে তোলা। তাই যে ডাক্তার নন্দী সর্বদা শত শত মুসলমান রোগীর চিকিৎসা, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন নিঃস্বার্থ ভাবেই, তার অনুপস্থিতিতে তার সে বাড়িই একদিন দখল করে সুযোগ সন্ধানী মুসলমানেরা। তার বিশ্বাসের মূলে যেন একই সাথে কুঠারাঘাত করে দাঙ্গাবাজ মুসলমান ও সরকার। তাই তিনি বলেছেন-

> দাঙ্গা লাগায় স্বার্থান্বেষীরা। মদত দেয় সরকার। এসবই নষ্ট রাজনীতির ফল।[১০]

ডাক্তার নন্দী ছিলেন দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানের ভগবান। তাদের ছেড়ে চলে যাওয়া তিনি মনুষ্যত্বের অপমান বলে মনে করতেন। কিন্তু তার বাড়ি দখল হবার পরে, বাড়ির চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা দরিদ্র মানুষেরা ডাক্তারবাবুকে ফিরে আসার অনুরোধ জানালেও তিনি আর কখনই ফিরে আসেননি। আর ঠিক এভাবেই এক এক করে দখল হয়ে যায় অনিমেষদের বাড়ি সহ সকল হিন্দুদের বাড়ি। যেদিন অনিমেষের বাড়ির সকলে অন্যত্র যাত্রা করে, অনিমেষ তাদের সে যাত্রার আখ্যা দিয়েছে- 'দ্য একসোডাস'[১১]। অনিমেষ ও ডাক্তার নন্দী এদেশের নাগরিক হবার পরেও, শুধু মাত্র হিন্দু হবার কারণেই তাদের বাড়ি দখল হয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে আবদুল মালেক ভারত থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এলেও কিন্তু তার ঘরবাড়ি না পাকিস্তান সরকার, না জনগণ কেউই দখল করেনি। আসলে সরকার যা করেছেন, তা মূলত দেশ থেকে সংখ্যালঘুর নিঃস্বকরণ।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি দাঙ্গার রেশ সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাদের স্বাভাবিক হতে কেটেছে অনেকটা সময়। উপন্যাসের সমাপ্তির পূর্বে আমরা লক্ষ্য করি, দাঙ্গার ভয় সকলের মন থেকেই প্রায় চিরতরের জন্য প্রশমিত হয়েছে। তাই অনিমেষের বোন শীলাকে বিবাহে মত দেয় নৃপেন কুণ্ডু। বিয়ে হয় আশরাফের, আবদুল মালেক ও আনোয়ারারও এবং বিয়ে হয় অনিমেষ ও মাধুরীর।

উপন্যাসে পাকিস্তানের মুসলিম জনগণ ও মুসলিম শাসকের বর্বর চিত্রকে সেলিনা হোসেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সরকারের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জীবন তছনছ হয়ে যাবার পরেও, লেখক আবার এক নতুন ভোরের স্বপ্ন দেখেছেন। ইঙ্গিত দিয়েছেন এক নতুন প্রজন্মের শুভারম্ভের। চিন্তাভাবনার গভীরতা ও সাবলীল ভাষা সেলিনা হোসেনকে একজন কলম সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছে। সামাজিক দায় এবং গভীরে প্রবেশ করে সমাজকে দেখার তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তা অন্যদের থেকে তাঁকে পৃথক ভুবন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

তথ্যসূত্র ও উৎস নির্দেশ :

১. হোসেন সেলিনা *সোনালি ডুমুর আনন্দ* পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৮১
২. সিংহ কঙ্কর *সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট* অনন্যা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ১৯৯৭, পৃ. ১৫৭
৩. হোসেন সেলিনা *সোনালি ডুমুর আনন্দ* পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ১৯৫
৪. বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা* র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৬৩
৫. হোসেন সেলিনা *সোনালি ডুমুর* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ৯৬
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০
৮. হোসেন সেলিনা *প্রবন্ধ সংকলন* সুশীল সাহা (সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৯, পৃ. ৪৮৩
৯. হোসেন সেলিনা *সোনালি ডুমুর* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ২৫৬
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮২
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২